চিরায়ত বই

২৫

# জীবনস্মৃতি

# জীবনস্মৃতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

KOBI PROKASHANI

জীবনস্মৃতি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : মে ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

নান্দীমুখ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৪০০ টাকা

Jibon Smriti by Rabindranath Tagore Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: May 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US$ 20
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

**ISBN:** 978-984-98111-5-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

## গ্রন্থপরিচয়

জীবনস্মৃতি ১৩১৯ (জুলাই ১৯১২) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক অঙ্কিত চব্বিশটি চিত্রে শোভিত হইয়া এই প্রথম সংস্করণ বাহির হয়।

তৎপূর্বে জীবনস্মৃতি প্রবাসী মাসিকপত্রে (ভাদ্র ১৩১৮-শ্রাবণ ১৩১৯) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

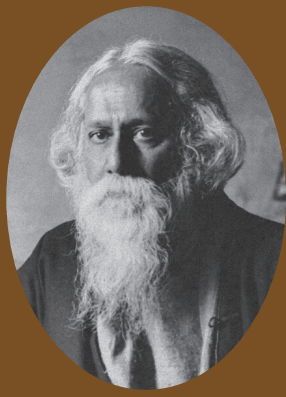

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭ মে ১৮৬১ সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তাঁর জন্ম। প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র। কৈশোরেই রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়। পিতার সঙ্গ তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর কৈশোরে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথ আজীবন এই মহিলার স্নেহস্মৃতি লালন করেছেন।

তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা *বনফুল* (১৮৭২) এবং *কবিকাহিনী* (১৮৭৮)। এগুলো তাঁর উন্মেষ পর্বের রচনা। *বাল্মীকি প্রতিভা* (১৮৮১) নাটক, *সন্ধ্যাসঙ্গীত* (১৮৮২), *প্রভাতসঙ্গীত* (১৮৮৩), *ছবি ও গান* (১৮৮৪), *কড়ি ও কোমল* (১৮৮৬) প্রভৃতি রচনা থেকেই তাঁর নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ। ১৮৯০ সালে *মানসী* কাব্যের প্রকাশ। এই সময় থেকেই তাঁর সৃজনীশক্তি বিচিত্রপথে আত্মপ্রকাশ করে এবং ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই তিনি বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত কবিতার *Gitanjali* নামে ইংরেজি অনুবাদ ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয়। মূলত এই গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান এবং সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন। ৭ আগস্ট ১৯৪১ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

সংযোজিত পাদটীকাংশে নিম্ন সংকেতগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রন্থ বা সাময়িকের নামে সাধারণত উদ্‌ধৃতিচিহ্ন দেওয়া হয় নাই।

রচনাবলী = রবীন্দ্র-রচনাবলী
রচনাবলী-অ = রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ
গ্র-পরিচয় = রবীন্দ্র-রচনাবলী, গ্রন্থপরিচয়
চরিত্রমালা = সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা
গ্রন্থোত্তর সংখ্যা (১, ২ ইত্যাদি) খণ্ড-জ্ঞাপক
জ্যোতিস্মৃতি = জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি
র-পরিচয় = রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয় র-কথা = রবীন্দ্রকথা
দ্র = দ্রষ্টব্য তু = তুলনীয় ইং = ইংরেজি পৃ = পৃষ্ঠা

রবীন্দ্রনাথ। ১৮৭৭
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত পেনসিল-স্কেচ অবলম্বনে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক অঙ্কিত

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা-কিছু ঘটিতেছে, তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।

এইরূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুয়ের মধ্যে যোগ আছে অথচ দু'ই ঠিক নহে।

আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে ভালো করিয়া তাকাইবার আমাদের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক-একটা অংশের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে। যে-চিত্রকর অনবরত আঁকিতেছে, সে যে কেন আঁকিতেছে, তাহার আঁকা যখন শেষ হইবে তখন এই ছবিগুলি যে কোন্ চিত্রশালায় টাঙাইয়া রাখা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে, একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্-এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে, তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে—সে-রঙ তাহার নিজের ভান্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে—সুতরাং, পটের উপর যে-ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।

এই স্মৃতির ভান্ডারে অত্যন্ত যথাযথরূপে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু ছবি দেখার একটা নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। যখন পথিক যে-পথটাতে চলিতেছে বা যে-পান্থশালায় বাস করিতেছে, তখন সে-পথ বা সে-পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে—তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ।

যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়। জীবনের প্রভাতে যে-সকল শহর এবং মাঠ, নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাহ্ণে বিশ্রামশালায় প্রবেশের পূর্বে যখন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায়, তখন আসন্ন দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোখে পড়ে। পিছন ফিরিয়া সেই ছবি দেখার অবসর যখন ঘটিল, সেদিকে একবার যখন তাকাইলাম, তখন তাহাতে মন নিবিষ্ট হইয়া গেল।

মনের মধ্যে যে-ঔৎসুক্য জন্মিল তাহা কি কেবলমাত্র নিজের অতীতজীবনের প্রতি স্বাভাবিক মমত্বজনিত। অবশ্য, মমতা কিছু না থাকিয়া যায় না, কিন্তু ছবি বলিয়াই ছবিরও একটা আকর্ষণ আছে। উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কে সীতার চিত্ত বিনোদনের জন্য লক্ষ্মণ যে-ছবিগুলি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাদের সঙ্গে সীতার জীবনের যোগ ছিল বলিয়াই যে তাহারা মনোহর, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

এই স্মৃতির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। কিন্তু বিষয়ের মর্যাদার উপরেই যে সাহিত্যের নির্ভর তাহা নহে; যাহা ভালো করিয়া অনুভব করিয়াছি, তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই মানুষের কাছে তাহার আদর আছে। নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই, তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

এই স্মৃতিচিত্রগুলিও সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাকে জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে-হিসাবে এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক।

## শিক্ষারম্ভ

আমরা তিনটি বালক[১] একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম। আমার সঙ্গীদুটি আমার চেয়ে দুই বছরের বড়ো। তাঁহারা যখন গুরুমহাশয়ের[২] কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শুরু হইল[৩], কিন্তু সে-কথা আমার মনেও নাই।

---

[১] "আমার দাদা সোমেন্দ্রনাথ, আমার ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ [গঙ্গোপাধ্যায়] এবং আমি।"—পাণ্ডুলিপি

[২] মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—র-কথা

[৩] বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায়—ছেলেবেলা, অধ্যায় ৮

কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' তখন 'কর, খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।'[১] আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।

এই শিশুকালে আরেকটা কথা মনের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গেছে। আমাদের একটি অনেক কালের খাজাঞ্চি ছিল, কৈলাস মুখুজ্যে তাহার নাম। সে আমাদের ঘরের আত্মীয়েরই মতো। লোকটি ভারি রসিক। সকলের সঙ্গেই তাহার হাসিতামাশা। বাড়িতে নূতনসমাগত জামাতাদিগকে সে বিদ্রুপে কৌতুকে বিপন্ন করিয়া তুলিত। মৃত্যুর পরেও তাহার কৌতুকপরতা কমে নাই, এরূপ জনশ্রুতি আছে। একসময়ে আমার গুরুজনেরা প্ল্যাঞ্চেট-যোগে পরলোকের সহিত ডাক বসাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ছিলেন। একদিন তাঁহাদের প্ল্যাঞ্চেটের পেন্সিলের রেখায় কৈলাস মুখুজ্যের নাম দেখা দিল। উত্তর আসিল, আমি মরিয়া যাহা জানিয়াছি, আপনারা বাঁচিয়াই তাহা ফাঁকি দিয়া জানিতে চান? সেটি হইবে না।

সেই কৈলাস মুখুজ্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটা ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত। আপাদমস্তক তাহার যে বহুমূল্য অলংকারের তালিকা পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোৎসবের যে অভূতপূর্ব সমারোহের বর্ণনা শুনা যাইত, তাহাতে অনেক প্রবীণবয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত—কিন্তু বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানাবর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য সুখচ্ছবি দেখিতে পাইত, তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা। শিশুকালের সাহিত্যরসভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে—আর মনে

[১] দ্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রণীত বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ

পড়ে, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।' ঐ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।

তাহার পরে যে কথাটা মনে পড়িতেছে তাহা স্কুলে যাওয়ার সূচনা। একদিন দেখিলাম, দাদা এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সত্য ইস্কুলে গেলেন, কিন্তু আমি ইস্কুলে যাইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইলাম না। উচ্চৈঃস্বরে কান্না ছাড়া যোগ্যতা প্রচার করার আর-কোনো উপায় আমার হাতে ছিল না। ইহার পূর্বে কোনোদিন গাড়িও চড়ি নাই বাড়ির বাহিরও হই নাই, তাই সত্য যখন ইস্কুল-পথের ভ্রমণবৃত্তান্তটিকে অতিশয়োক্তি-অলংকারে প্রত্যহই অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল তখন ঘরে আর মন কিছুতেই টিকিতে চাহিল না। যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি আমার মোহ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাতসহ এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন, "এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।" সে শিক্ষকের নামধাম আকৃতিপ্রকৃতি আমার কিছুই মনে নাই—কিন্তু সেই গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। এতবড়ো অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী জীবনে আর-কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।

কান্নার জোরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে[১] অকালে ভরতি হইলাম। সেখানে কী শিক্ষালাভ করিলাম মনে নাই কিন্তু একটা শাসনপ্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি শ্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত। এরূপে ধারণাশক্তির অভ্যাস বাহির হইতে অন্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে কি না তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচ্য।

এমনি করিয়া নিতান্ত শিশুবয়সেই আমার পড়া আরম্ভ হইল। চাকরদের মহলে যে-সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস-রামায়ণই প্রধান। সেই রামায়ণ পড়ার একটা দিনের ছবি মনে স্পষ্ট জাগিতেছে।

সেদিন মেঘলা করিয়াছে; বাহিরবাড়িতে রাস্তার ধারের লম্বা বারান্দাটিতে খেলিতেছি। মনে নাই সত্য কী কারণে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য হঠাৎ 'পুলিসম্যান' 'পুলিসম্যান' করিয়া ডাকিতে লাগিল। পুলিসম্যানের কর্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত মোটামুটি রকমের একটা ধারণা আমার ছিল। আমি জানিতাম, একটা লোককে অপরাধী বলিয়া তাহাদের

[১] গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয়, স্থাপিত ১৮২৩। বিদ্যালয়টি তখন "গরানহাটায় গোরাচাঁদ বশাকের বাটীতে" অবস্থিত ছিল।

হাতে দিবামাত্রই, কুমির যেমন খাঁজকাটা দাঁতের মধ্যে শিকারকে বিদ্ধ করিয়া জলের তলে অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি করিয়া হতভাগ্যকে চাপিয়া ধরিয়া অতলস্পর্শ থানার মধ্যে অন্তর্হিত হওয়াই পুলিসকর্মচারীর স্বাভাবিক ধর্ম। এরূপ নির্মম শাসনবিধি হইতে নিরপরাধ বালকের পরিত্রাণ কোথায় তাহা ভাবিয়া না পাইয়া একেবারে অন্তঃপুরে দৌড় দিলাম; পশ্চাতে তাহারা অনুসরণ করিতেছে এই অন্ধভয় আমার সমস্ত পৃষ্ঠদেশকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। মাকে[১] গিয়া আমার আসন্ন বিপদের সংবাদ জানাইলাম; তাহাতে তাঁহার বিশেষ উৎকণ্ঠার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। কিন্তু আমি বাহিরে যাওয়া নিরাপদ বোধ করিলাম না। দিদিমা, আমার মাতার কোনো-এক সম্পর্কে খুড়ি[২], যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্বেলকাগজ-মণ্ডিত কোণছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা; সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্ণের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো-একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

## ঘর ও বাহির

আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই চলে। মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালে ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখিলে এখনকার কাল লজ্জায় তাহার সঙ্গে সকলপ্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিবে। এই তো তখনকার কালের বিশেষত্ব, তাহার 'পরে আবার বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিল না। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই।

---

[১] সারদাদেবী (১৮২৪-৭৫), বিবাহ ১৮২৯-৩০। মতান্তরে (রবীন্দ্র কথা পৃ ১-৪) : সারদাদেবীর জন্ম, ইং ১৮২৬; বিবাহ, ফাল্গুন ১২৪০ (১৮৩৪)

[২] সারদাদেবীর "কাকার দ্বিতীয় পক্ষের বিধবা স্ত্রী", "তিনি প্রায় মায়ের [সারদাদেবীর] সমবয়সী ছিলেন।"—জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আত্মচরিত, পাণ্ডুলিপি

আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্তব্যকে সরল করিয়া লইবার জন্য তাহারা আমাদের নড়াচড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাক্, অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা—সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো-পরানো সাজানো-গোজানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারি দিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।

আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণে মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর-একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। কেবল, আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম—কারণ, এমন বালক কোনো অকিঞ্চনের ঘরে জন্মগ্রহণ করে নাই, পকেটে রাখিবার মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্র নাই; বিধাতার কৃপায় শিশুর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্ধনের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতিপদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম—তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত যে পাদুকাসৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

আমাদের চেয়ে যাঁহারা বড়ো তাঁহাদের গতিবিধি, বেশভূষা, আহারবিহার, আরাম-আমোদ, আলাপ-আলোচনা, সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহুদূরে ছিল। তাহার অভ্যাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না। এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘু করিয়া লইয়াছে; কোথাও তাহাদের কোনো বাধা নাই এবং না চাহিতেই তাহারা সমস্ত পায়। আমরা এত সহজে কিছুই পাই নাই। কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল; বড়ো হইলে কোনো-এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের-জিম্মায় সমর্পণ করিয়া বসিয়াছিলাম। তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্য যাহা-কিছু পাইতাম তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁঠি পর্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না। এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি, তাহারা সহজেই সব জিনিস পায় বলিয়া তাহারা বারো-আনাকেই আধখানা কামড় দিয়া বিসর্জন করে—তাহাদের পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়েই নষ্ট হয়।